विश्वभारती
VISVA-BHARATI
(Established by the Parliament of India under Visva-Bharati Act XXIX of 1951
Vide Notification No. : 40-5/50 G.3 Dt. 14 May, 1951)
संस्थापक
रवीन्द्रनाथ ठाकुर
FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

आचार्य
श्री नरेंद्र मोदी
ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI
उपाचार्य
प्रो. विद्युत चक्रवर्ती
UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

शांतिनिकेतन - 731235
SANTINIKETAN - 731235
जि.वीरभूम, पश्चिम बंगाल, भारत
DIST. BIRBHUM, WEST BENGAL, INDIA
फोन Tel: +91-3463-262 451/261 531
फैक्स Fax: +91-3463-262 672
ई-मेल E-mail: vice-chancellor@visva-bharati.ac.in
Website: www.visva-bharati.ac.in

सं./No.________________ दिनांक/Date.________________

অষ্টম বার্তালাপ

আমার সহকর্মীবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রাসাচ্ছাদন ও ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির প্রশ্নে বিশ্বভারতীর উপর নির্ভরশীল বন্ধুদের উদ্দেশে—

৮ আগস্ট ২০২০

বিশ্বভারতীর ভাবাদর্শ

বিশ্বভারতীতে আমার প্রায় দুবছরের এই অবস্থানকালে যে-ব্যাপারটা আমার সবচেয়ে বিরক্তিকর ঠেকেছে তা হল 'বিশ্বভারতীর ভাবাদর্শ'! 'বিশ্বভারতীর ভাবাদর্শ' বলতে কী বুঝব? এ কি কেবল তেমন একটা শিক্ষাকেন্দ্র যে পড়াশোনার শেষে নির্দিষ্ট শর্তপূরণের পর শুধু ডিগ্রি বিতরণ করে যাবে? নাকি এ তেমনই এক প্রতিষ্ঠান যে আরোপিত শিক্ষাচর্চার পরিবর্তে রচনা করবে স্বাভাবিক জ্ঞানচর্চার উপযুক্ত পরিমণ্ডল? বিশ্বভারতী কি তেমন একটা জায়গা যাকে নিংড়ে নিয়ে শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিই করে যাবে কেউ কেউ? নাকি, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ কী চাইতেন তার তোয়াক্কা না করে প্রত্যেকের নিজেকে 'রাবীন্দ্রিক' ঘোষণা করার জায়গার নামই বিশ্বভারতী? বস্তুত মানবতার নামে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার শিক্ষালাভের জায়গাই কি নয় বিশ্বভারতী? প্রশ্নের সংখ্যা এভাবে বাড়িয়ে নেওয়া যায় বহুগুণ। বাড়ানোই যায়, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় যাঁরা চালান; আর যাঁরা 'সোনার ডিমপাড়া রাজহাঁস'-এর গল্পের সেই সুবিধাভোগী মানুষ— তাঁদের 'সৌজন্যে' গত কয়েকদশকে বিশ্বভারতীর গুরুত্ব নেমে গেছে অনেকটাই। এই দুরবস্থা ঠেকানোর চেষ্টা করা হয়েছিল অবশ্যই, কিন্তু

তা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়নি। ফলপ্রসূ হয়নি তার কারণ সেইসব দুষ্ট লোকেরা, যারা নিজেদের লোকসান এড়াবার জন্য প্রশাসকদের তটস্থ করে রাখতে বদ মতলব এঁটে চলেছিল সবসময়। ফলে ভয়ংকর ক্ষতি হয়ে গেছে বিশ্বভারতীর: কখনও অবৈধ নিয়োগের কারণে গ্রেপ্তার হতে হয়েছে উপাচার্যকে, কখনওবা নিয়োগের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে দেওয়া হয়েছে নিয়োগপত্র; এবং পুনরায় খতিয়ে দেখতে হয়েছে নির্বাচিত প্রার্থীদের কাগজপত্র। এইজাতীয় অবহেলার কারণেই বিশ্বভারতীর নিজস্ব সম্পত্তিও দখল করে নিয়েছে লোকে। প্রত্যেকের এই ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থতার কারণে বিশ্বভারতীর অবস্থা দাঁড়িয়েছে অনাথ শিশুর মতো! বিশ্বভারতীর নামে মজা লুটে, 'রাবীন্দ্রিক' সেজে আমরা অনেকেই আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি, যার কোনও সারবত্তাই নেই। এটা পরিহাসের বিষয় যে একটি ঐতিহ্যশালী ক্যাম্পাস 'উৎকর্ষ কেন্দ্র' হওয়ার বদলে স্বার্থসিদ্ধির একটি 'উদ্বাস্তু কেন্দ্র' হয়ে পড়ছে; যা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আজীবন সাধনার বিপরীত। সবাই জানেন একথা যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ শুধু পথপ্রদর্শকমাত্র ছিলেন না; ছিলেন সেইসময়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বদলে দিতে-চাওয়া একজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব; যিনি সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাঁকিয়ে বসে থাকা কায়েমি বিভাজনরেখাগুলি দূর করতে চেয়েছিলেন।

সমাজ-সংস্কারক কবি সেইসময়ের ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রতিকূল প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আত্মশক্তিসম্পন্ন মানবতার পূর্ণ জাগরণের জন্য যা প্রয়োজন তার কোনও চেষ্টারই খামতি রাখেননি। একজন প্রয়োগবাদী হিসেবে কবি তাঁর পরিকল্পনা-প্রকৌশলের রূপায়ণ ঘটাতে চেয়েছিলেন বিশ্বভারতী-সন্নিহিত গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে, যা গ্রামবাসীদের সহজেই আকৃষ্ট করেছিল। এই পুনর্গঠন-পরিকল্পনা ব্যক্ত হয়েছিল ১৯০৪ সালে প্রকাশিত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে, যেখানে ভারতীয় গ্রামগুলিকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিক সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটেছিল। খুব তন্নিষ্ঠভাবে লেখাটি পড়লে বোঝা যায় হেনরি মেইনের ১৮৭১ সালে প্রকাশিত 'ভিলেজ কমিউনিটি ইন ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট' বইতে গ্রামীণ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের নিরিখে প্রাচ্যের আত্মনির্ভরশীল গ্রামীণ সাধারণতন্ত্রের যে মডেল; যার প্রশংসা করেছেন স্বয়ং লেখক— তার সঙ্গে 'স্বদেশী সমাজ'-এর দুর্দান্ত মিল লক্ষ করা যায়! রবীন্দ্রনাথের অনেক সাহিত্য-দৃষ্টান্ত থেকেও বোঝা যায়, সেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ভাবনাচিন্তাগুলিকে কত সাবলীলভাবে বিস্তার করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসের নিখিলেশ দৈনন্দিন ব্যবহার্য সাবান, মোমবাতি ইত্যাদি পণ্যের উৎপাদনে উদ্যোগী হয়েছিলেন যার মাধ্যমে স্বদেশী শিল্প উৎসাহিত হতে পারে

বলে তাঁর মনে হয়েছিল। একইভাবে 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনী সচেষ্ট হন ল্যাবরেটরি স্থাপনার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জ্ঞানচর্চায় সহায়তা করার লক্ষ্যে। এই উদাহরণগুলি দেওয়া হচ্ছে শুধু এটা বোঝাতে যে গুরুদেব শুধু একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বমাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সমাজনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যিনি ভারতবর্ষের যথার্থ অগ্রগতির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নির্ধারণ করে অগ্রসর হয়েছিলেন। এমনকি সেই ঘটনাপ্রবাহের সময় তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন যখন নানাবিধ ঔপনিবেশিক চিন্তাজটে আমরা স্বাধীনভাবে কিছু ভেবে ওঠার মানসিক সামর্থ্য পর্যন্ত হারিয়ে বসেছিলাম! যে-কথাটা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার তা হল জীবনের প্রথম পর্বে জ্ঞানদীপ্তির আলোয় বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও, মূলত তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে তিনি ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়নের উপর সমান গুরুত্বারোপ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ব্রাহ্মসমাজের সহধর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় মনীষাদীপ্ত চিন্তাধারার হারিয়ে-যাওয়া স্রোতটিকে ফিরিয়ে আনার জন্য কঠোর শ্রমস্বীকার করেছিলেন। জ্ঞানচর্চার সে ধারা ছিল যথেষ্ট সূক্ষ্ম ও ঋদ্ধিময়। মহর্ষি এবং তাঁর সহযোগীদের চিত্তের এই উদ্ভাসন তাঁরা ব্রাহ্মসমাজ গঠনের মাধ্যমে রূপায়িত করেছিলেন; যা ঔপনিষদিক ভিত্তির উপর মনুষ্যত্বের নতুন একটা তত্ত্বধারণা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পিতৃদেবের চিন্তাধারার সঙ্গে প্রবল মানসিক ঐকাত্ম্যের কারণে রবীন্দ্রনাথ চিন্তাধারার একটি স্বকীয় পন্থানির্দেশ করেছিলেন যা তিনি তাঁর পিতৃদেবের কাছ থেকেই অর্জন করেছিলেন। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী হিসেবে বিকশিত হয়েছিল শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবেই নয়; এ হল এমন একটি স্থান যার নামের মধ্যেই একটা 'আদর্শ'-এর ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়েছে: 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেক নীড়ম' (যেখানে সমগ্র বিশ্ব এসে একটি নীড়ে সম্মিলিত হয়)! এইদিক থেকে 'বিশ্বভারতী' একটি 'ভাবাদর্শ'-এর নাম; মানুষের মানবিক অস্তিত্বের একটি ধারণা তার মধ্যে রূপ-পরিগ্রহ করে আছে, মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রকে একত্রিত করার একটি আধার হিসেবেও পরিকল্পিত হয়েছে তার আদল।

এই বার্তালাপে কেন এত দীর্ঘ উপক্রমণিকা?

বিশ্বভারতী দ্রুত অধঃপাতে যাচ্ছে। এই অধঃপাতের গতি অপ্রত্যাশিত হলেও এটা বেশ বলবার মতোই বিষয় যে বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ মানুষ সমবেতভাবে আবার তার পুরনো গরিমা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছেন। আশ্রমে প্রায় দুবছর অবস্থান করার অভিজ্ঞতার সুবাদে আমি জোর দিয়েই বলতে পারি, শুধু বিদ্যাসৃজন বা বিদ্যা-বিতরণের কেন্দ্র হিসেবেই নয়; উন্নয়নের প্রশ্নে আমাদের সমষ্টিগত আকাঙ্ক্ষা,

সমষ্টিগত যাপন এবং সমষ্টিগত অর্জনের একটি আদর্শ হিসেবে বিশ্বভারতী কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বভারতী তার 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' নীতিমন্ত্রটিকে এভাবেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে চলেছে। সূচনাপর্ব থেকে বিশ্বভারতীর ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যাবে, গুরুদেব শ্রেণি-বর্ণ-জাতপাত নির্বিশেষে আশ্রমজীবনে যৌথ জীবন-যাপনের মর্মচেতনা সঞ্চারিত করে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। অন্যের পরিবর্তনের চেয়ে মানুষের নিজের পরিবর্তনই ছিল গুরুদেবের অধিকতর প্রত্যাশিত, যেমন গালিব বলেছিলেন, 'উমর ভর গালিব য়েহি গুনাহ্ করতা রহা, ধূল চেহ্রে পে থে, আউর আয়না সাফ করতা রহা'(গালিব সারাজীবন একটাই ভুল করে গেল, ধুলো ছিল তার শরীরে আর সে সাফ করছিল কিনা আয়নার কাচ!)।

সুতরাং এই বার্তালাপ হল সবাইকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করার আহ্বান। আমাদের উপস্থিত উপকরণ নিয়েই উচ্চজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বভারতীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কোনও কোনও দিক থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয় হল অনন্য, যার তুলনা মেলা ভার। বিশ্বভারতীতে সংগীত, কলা এবং নন্দনবিদ্যা শেখানোর ব্যবস্থা আছে যা পৃথিবীর নানাপ্রান্তের ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট করে। শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের দিক থেকেই এই বিভাগগুলি আন্তর্জাতিক তা নয়, শিক্ষক ও শিক্ষণের দিক থেকেও এগুলি আন্তর্জাতিক। আমাদের ডিগ্রিপ্রাপ্তদের সর্বত্র প্রত্যাশা করা হয় কারণ তাঁরা এমনভাবে এখানে শেখেন যা দুর্লভ। তাছাড়া শ্রীনিকেতনের পল্লিশিক্ষাভবন পল্লিসংগঠন বিভাগ ইত্যাদি পল্লিপুনর্গঠনের এমন সব বিভাগ আছে যেখানে তত্ত্বগত বিদ্যার সঙ্গে প্রয়োগগত বিদ্যার একটা সৃজনাত্মক সমন্বয় ঘটেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে লেখাপড়ার বিস্তার ঘটানো এবং গ্রামের মানুষকে হাতে-কলমে কাজ শিখিয়ে তাঁদের জীবন-জীবিকায় দক্ষ করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, এই বিভাগগুলি এখনও সেই কাজের ধারা বয়ে নিয়ে চলেছে। যেমন গ্রামীণ শিল্প, প্রযুক্তি ও তার ধারাধরনের জন্য বিশেষ কেন্দ্র হল শিল্পসদন। যেহেতু এই বিভাগগুলির পাঠক্রমের মধ্যেও হাতে-কলমে শিক্ষার সংস্থান রাখা হয় সেজন্য এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের তত্ত্ব এবং প্রয়োগ— পল্লিপুনর্গঠনের পুথিগত অভিজ্ঞতা ও সেই অভিজ্ঞতার প্রয়োগ— দুদিক থেকেই প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়।

শান্তিনিকেতনে আছে ভাষাভবন, বিদ্যাভবন, শিক্ষাভবন— নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিদ্যাচর্চা ও বিদ্যাদানে প্রতিষ্ঠানগুলি বহুপরিচিত। বিশ্বভারতীর কিছু সংখ্যক অধ্যাপক তাঁদের নিজস্ব ক্ষেত্রে এককভাবে যথেষ্ট ভাল কাজ করছেন কিন্তু সমষ্টিগত কাজে তাঁদের খুব কমই এগিয়ে আসতে দেখা যায়। এটা বেশ দুঃখজনক ব্যাপার যে ভারতবর্ষের

সব বিশ্ববিদ্যালয়েই; বিশেষ করে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপকেরা মতাদর্শগত বা সমাজ-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পন্থাগত প্রশ্ন নিয়ে বৌদ্ধিক মতান্তরের কারণ ছাড়াই কেবল ব্যক্তিগত স্তরের মতানৈক্যের কারণে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেন না! এও দুঃখের ব্যাপার, সেই মতানৈক্য অনেকসময় এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় যে বিভাগে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য উপাচার্য বা ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের তারমধ্যে হস্তক্ষেপ পর্যন্ত করতে হয়! বিনয়ভবন স্বমহিমামণ্ডিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভবন। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সেখানকার সহকর্মীদের সম্ভাবনার একেবারে সদ্ব্যবহার হয়নি তা না বলা গেলেও বলতেই হয় তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যব্যবহারও করা যায়নি। করা যায়নি তার কারণ কিন্তু পরিকাঠামোগত সমস্যা বা অন্যকিছু নয়; তা শুধু সেখানকার সহকর্মীদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতিমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে না পারার কারণে! আশা করব, 'ঐক্যে বিকাশ আর অনৈক্যে বিনাশ' কথাটার মর্ম বুঝতে পারলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

আরও অনেক ভবন আছে যা বিশ্বভারতীকে মূলগতভাবে সুগঠিত করে তুলেছে। এই ভবনগুলির প্রত্যেকটির অবদান আলাদা করে না বলে এগুলির মধ্যে প্রমুখ প্রতিষ্ঠান হিসেবে রবীন্দ্রভবনের প্রসঙ্গ নিশ্চয় বলা যায়, যেখানকার বাড়িগুলিতে গুরুদেব তাঁর শান্তিনিকেতনের দিনগুলি কাটিয়েছেন; যেখানে তাঁর জীবন ও সৃষ্টিসম্ভারের সংগ্রহশালা রয়েছে, রয়েছে তাঁর ছবি এবং অসংখ্য রচনার পাণ্ডুলিপি যা তাঁকে জগতের অন্যতম প্রতিভা-শিরোমণি হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে! যাঁরা শান্তিনিকেতনে আসেন, রবীন্দ্রভবনে যান, তাঁদের কাছে সে এক তীর্থস্থানে আগমন; আর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পর্যটকদের এই আগমন অর্থাগমের একটা অটুট উৎস। রবীন্দ্রভবনের মতো রয়েছে বাংলাদেশ ভবন, যা শুধু তার অনুপম স্থাপত্য-সৌন্দর্যের জন্যই নয়; ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক-সম্বন্ধ সংহত করার প্রশ্নেও যা সচেষ্ট রয়েছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ হলেন সেই সম্বন্ধ-সেতু যিনি শুধু সীমানার দুপারের বঙ্গসংস্কৃতির পরিপোষ্টামাত্র নন, তিনিই এই দুই মহান জাতির জাতীয় সংগীতের স্রষ্টা। বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় এবং ভারত সরকারের পরিপূরক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ভবন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পরস্পর ওতপ্রোত দুইদেশের সম্বন্ধসূত্র হিসেবে একটি খুব দৃঢ় পদক্ষেপ। বিশ্বভারতীর ইতিহাসে এ খুব ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত চীনাভবন, ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত জাপানি বিভাগ(যদিও জাপানি ভাষাশিক্ষার প্রচলন শুরু হয় ১৯০৫ সাল থেকেই)ইত্যাদির সূচনা হয়েছিল বিদেশের পৃষ্ঠপোষকতাতেই।

রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের মহতী উত্তরাধিকার ছাড়াও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে বিশ্বভারতীর গৌরব করবার মতো অনেক কিছুই আছে। এটা ঠিক, অনেক বিভাগেই অনেক অধ্যাপক আছেন যাঁরা প্রত্যাশা অনুযায়ী তাঁদের বিষয়ে উপযুক্ত অবদান রাখতে পারেন না। আবার এমনও অনেকে আছেন যাঁদের শুধু নিজেদের বিষয়ে অবদান আছে এই জন্যই নয়, তাঁদের জ্ঞানের সপ্রতিভতা এবং উৎকর্ষও রয়েছে। আমি খেয়াল করেছি, স্বাস্থ্যকর পরিমণ্ডল রচনার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত তরুণ অধ্যাপকেরা তাঁদের বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকেন। পৃথিবীর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রগতির ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে সারাপৃথিবীতেই এটা প্রমাণিত সত্য যে বিভাগের তরুণ এবং প্রবীণ সহকর্মীদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর ভাববিনিময়ই হল শিক্ষাক্ষেত্রের সাফল্যের মূল। দুদিক থেকে এটা একটা অসাধারণ অগ্রগতি: এরফলে শুধু অধ্যাপকদের পরস্পর দূরত্ব কমে আসবে তা-ই নয়, তাতে আন্তর্বিষয়ক সহযোগিতা ও আদান-প্রদানও বৃদ্ধি পাবে যার উপর সারাপৃথিবীতেই এখন প্রবল উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের গ্রন্থাগারগুলি খুব বড় একটা সহায়ক মাধ্যম। বিপুল গ্রন্থসম্ভারসম্পন্ন এই গ্রন্থাগারগুলিতে ডিজিটাল এবং প্রথাসিদ্ধ— দুইভাবেই কাজ হয়ে থাকে। আশাকরি অল্পদিনের মধ্যেই আমরা আমাদের সংগ্রহের সমস্ত বইয়ের ডিজিটাল ভার্সান করে ফেলতে সক্ষম হব। যাঁরা পাঠকদের কাছে বইয়ের ঠিক-ঠিকানার হদিশ দিয়ে সাহায্য করেন তাঁরা আলাদা করে প্রশংসার যোগ্য। তাছাড়া, যে তৎপরতা ও দক্ষতার সঙ্গে নতুন বই আনা হয়েছে গ্রন্থাগারে আমি তার অবশ্যই তারিফ করব। গ্রন্থাগারের সাময়িকপত্র-পত্রিকার বিভাগটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং প্রয়োজনমতো সহজেই তা পাওয়া যায়।। আমাদের গ্রন্থাগারকর্মীরা শুধু যে পাঠকদের বই খুঁজে দেওয়ার জন্য সাহায্য-তৎপর তাই নয়, আন্তর্গ্রন্থাগার গ্রন্থকর্জ ব্যবস্থার মাধ্যমে পাঠকদের প্রয়োজনমতো বই পাইয়ে দিয়েও তাঁরা সাহায্য করে থাকেন। লক্ষণীয়ভাবে গ্রন্থাগার নিয়মিত ওয়েবিনারের আয়োজন হয়ে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-আয়োজিত এইরকম একাধিক ওয়েবিনারে যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। আমি অবশ্যই আয়োজক গ্রন্থাগারকর্মীদের বাহবা দেব যে ক্যাম্পাসে হাইস্পিড ইন্টারনেট না থাকা সত্ত্বেও ত্রুটিহীনভাবে ওয়েবিনার আয়োজন করে তাঁরা প্রায় অসম্ভব একটা কাজকে সম্ভব করে তুলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের নির্দেশে গান্ধীজির সমাজ-রাজনৈতিক ভাবনার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অধ্যাপকদের নিয়ে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার একটি ওয়েবিনার আয়োজন করেছে যা গান্ধীচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে। বস্তুত, আরও অন্যান্য ওয়েবিনারের মধ্যে এ হল এক সূচনা, যেখানে ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাচর্চার নানাধারার উপর যা

মোটের উপর আধিপত্যবাদী চিন্তার চেনা ছাঁচের বাইরে যথার্থ বিশ্লেষণধর্মী হয়ে উঠেছিল।

'সব হতে আপন'— যে-কথা আমাদের আশ্রমসংগীতের প্রথম চরণেই উদ্ধৃত রয়েছে, যা শান্তিনিকেতন আশ্রমের আদর্শ; তা আমাদের মধ্যে যাঁরা এখানকার নির্মল পরিবেশের সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের অন্তরের শক্তি জাগিয়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর মানবতার আদর্শে একইভাবে অনুপ্রাণিত সহযোগীদের নিঃস্বার্থ শ্রমস্বীকারের মধ্য দিয়ে আশ্রম ক্রমে বিবর্তনের ধারাপথে অভিব্যক্ত হয়েছে বিশ্বভারতী হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহযোগীরা বিশেষ করেই মুছে দিতে চেয়েছিলেন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ-প্রণোদিত মানুষে-মানুষে কৃত্রিম কৌলীন্যের ভেদরেখা, চেয়েছিলেন প্রান্তিকায়িত মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ।

এই ধারাবাহিক বার্তালাপগুলির উদ্দেশ্য নয় কাউকে অবমাননা বা আঘাত করা। এগুলির উদ্দেশ্য হল, যে সামাজিক অর্থনৈতিক এবং আদর্শ তথা মূলবোধগত সমবেত প্রয়াসের উপর ভিত্তি করে ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল— তা বারবার স্মরণ করা! যাঁরা বিশ্বভারতীর অনতি-অতীতের হৃতগৌরব ফিরে পেতে উৎসুক, এ হল তাঁদের সবার জন্য এক আত্মসমীক্ষা। এই বার্তালাপের মাধ্যমে কিছু অপ্রিয় সত্য জনসমক্ষে প্রকাশিত হওয়ার কারণে ব্যক্তিবিশেষ অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হতেই পারেন, কিন্তু যথার্থই যাঁরা রাবীন্দ্রিক তাঁরা নিশ্চয় সবাই সহমত পোষণ করবেন যে আরও অধোগতির হাত থেকে বিশ্বভারতীকে মুক্ত করতে চাইলে কোথাও একটা দাঁড়ি টানতেই হয়! ক্যাম্পাসে যা-কিছু ঘটে তার দায়ে আমি হয়ে পড়ি সবকিছুর একটা সস্তা নিশানা! অথচ সবাই জানেন, উপাচার্য হলেন একটা সঙ্ঘবদ্ধ কর্মিদলের অংশমাত্র। ভারত সরকারের সুনির্দিষ্ট বিধিনিয়ম এবং ১৯৫১ সালের বিশ্বভারতী আইন ও সংবিধি অনুসারে মসৃণভাবে বিশ্বভারতী পরিচালনার জন্যই এইদলের সদস্যরা মাসে-মাসে বেতন পেয়ে থাকেন! আমি একটা কর্মিদলের প্রতিনিধিত্ব করি; যে কর্মিদল গড়ে উঠেছে বিশ্বভারতী, মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রক এবং রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগগুলির কর্মী-আধিকারিকদের নিয়ে। এই বার্তালাপগুলি হল বিশ্বভারতীর পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির ফল। তিক্ত হলেও সত্য কথাটা হল এই যে বিশ্বভারতীর অপূরণীয় ক্ষতি কিছুতেই সামলে নেওয়া সম্ভব নয়; যদি না বিশ্বভারতীর কল্যাণসাধনকে আমরা সবাই একটা মিশন হিসেবে গ্রহণ করি! বিশ্বভারতীর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করছে আমাদেরও অস্তিত্ব; এবং আমাদের

কর্তব্য হল গুরুদেবের পূর্ণ অগ্রাধিকার-যুক্ত, সমাজ-রাজনৈতিক লক্ষ্যসাধনে নিবেদিত বিশ্বভারতীকে রক্ষা করার জন্য শপথ নেওয়া।

তার জন্য কী করণীয়?

আমি যা বলব তাকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করে আমাকে ভুল বুঝবেন না কেউ। বিশ্বভারতীর মঙ্গলের জন্য কার্যকর হতে পারে এগুলি তেমন কিছু প্রস্তাবমাত্র:

১। গুরুদেবের 'আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি/ নাচিবি ঘিরি ঘিরি, গাহিবি গান।'— নীতি অনুসরণ করে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশ্বভারতীর জন্য কাজ করব। প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গৌরবময় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই সমষ্টিবোধ আমরা প্রতিষ্ঠানের জন্য সযত্নে লালন করব।

২। বিশ্বভারতী থেকে যাঁরা জীবিকা-অর্জনের জন্য মাসিক বেতন পেয়ে থাকেন তাঁদের অস্তিত্বরক্ষা তত সহজ হবে না যদি বিশ্বভারতীই দুর্বল হয়ে পড়ে। যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের মানুষ হয়েও বিশ্বভারতীসূত্রেই জীবিকা-অর্জন করে থাকেন, বিশ্বভারতীর অস্তিত্বরক্ষা তাঁদের জন্যও সমান জরুরি, যেমন জরুরি তার বেতনভুকদের জন্য।

৩। বিশ্বভারতী কেবল ডিগ্রি-বিতরণের একটা প্রতিষ্ঠান নয়; এ হল জীবনের একটি পন্থাদর্শের নাম, আদর্শসাধনের একটি ভাবকল্পের নাম;— যা গুরুদেব তাঁর জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতাসূত্রে, বৈষম্য ও কৌলীন্য-কলুষিত ভেদবাদী সুবিধাভোগী সামান্য কিছু মানুষের পরিবর্তে দুর্ভাগা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের একটি সমন্বয়ী সমাজ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। যাঁরা নিজেদের 'রাবীন্দ্রিক' বলে গর্ব করেন তাঁদের নৈতিক কর্তব্য হল গুরুদেবের এই মর্মকথাটি আত্মস্থ করা এবং একটি বিকল্প বিদ্যাচর্চা তথা বিদ্যাদান কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বভারতীকে গড়ে তোলা।

৪। এই বার্তালাপগুলির লক্ষ্য আদপেই রক্ষণাত্মক নয়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মন্দিরে বুধবারের উপাসনায় যোগদান বিশ্বভারতী-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেইজন্য, যাঁরা তাঁদের অন্নসংস্থানের উৎস এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি নিজেদের কর্তব্য সুবিধামতো ভুলে যেতে চান তাঁদের প্রতিকূল সমালোচনা সত্ত্বেও আমি কথাগুলো বলে যাব। আমার সহকর্মীদের সঙ্গে এত কথাবার্তার পরও আমি নিজেই অবশ্য নিশ্চিত নই আমাদের মধ্যে কতজন তাঁদের অধীত বিদ্যা ও গবেষণাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করেছেন! অল্প কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ সহকর্মীই শুধু পাঠদানেই তাঁদের মনোনিবেশ করেছেন যা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার দুটি দিকের মধ্যে মাত্র একটি দিক। অন্যদিকটি

হল গবেষণা ও বিদ্যাসৃজন। আমি বলছি না যে আমরা বিদ্যাসৃজন করি না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলো একটু উলটে দেখলেই বোঝা যায় তাঁদের অনেকেই কড়া অ্যাকাডেমিক পরীক্ষায় উৎরাতে পারবেন না; যা যথার্থ অ্যাকাডেমিক সংস্কৃতির জন্য একান্ত জরুরি।

৫। এটা আমার কাছে খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার যে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা পৌষমেলা ও বসন্তোৎসব বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং তাকে 'রবীন্দ্রসংস্কৃতি-বিরোধী' বলে প্রচার করেন; যদিও এই ব্যবসায়ীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-ঐতিহ্যবাহী প্রায় কোনও অনুষ্ঠানেই অংশগ্রহণ করেন না! কারণটা জলের মতো পরিষ্কার: পৌষমেলা ও বসন্তোৎসব হল তাঁদের আয়ের উৎস। কিন্তু মন্দিরে উপাসনায় যোগদান বা বৈতালিকে অংশগ্রহণ কোনও অর্থাগমের সুযোগ করে দেয় না! তাহলে কীভাবেই বা সেগুলি ভেকধারী রবীন্দ্রিকদের আকৃষ্ট করবে?

৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের কিছু মানুষের সঙ্গে যোগসাজশ করে এবং গুরুদেবের আদর্শের বিজ্ঞাপন সামনে ঝুলিয়ে রেখে এখানে এখন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাঁদের রোজগারের নানা অভিসন্ধি করে চলেছে বছরের পর বছর। এতদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই প্রতারণাপূর্ণ কাজকর্মের কোনও বিহিত করার চেষ্টা হয়নি তার কারণ হয়তো এই যে, বিশ্বভারতীর ভিতরের মানুষদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনও 'আপনবোধ'-এরই জন্ম হয়নি। সৌভাগ্যক্রমে, বর্তমান প্রশাসন এই রেওয়াজ বন্ধ করার জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করে চলেছে। তবে, এই সংকল্পবদ্ধ গঠনমূলক পদক্ষেপের কারণে অনেক অপ্রীতিকর ও অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে: যেমন, জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশমতো পৌষমেলা গোটাতে গিয়ে আমাদের অগ্রণী সদস্যদের বিরুদ্ধে 'শ্লীলতাহানি'র অভিযোগে মামলা করে দেওয়া হয়েছে! বীরভূমের সেশন জজ মামলাটিকে স্বীকৃতি দেননি তা স্পষ্ট।

৭। বিশ্বভারতীর চলার পথের আরেকটা কাঁটা হল জমিহাঙরদের রাজ্যপাট, যা আমি আমার ষষ্ঠ বার্তালাপে বিস্তারিত বলেছিলাম। মানবসম্পদবিকাশ মন্ত্রকের ৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের নির্দেশ অনুসারে জবরদখলকারীদের হাত থেকে বিশ্বভারতীর জমি সম্পূর্ণ মুক্ত করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অক্লান্ত প্রয়াস করে চলেছে। অতীতে যখনই এই কাজ করবার চেষ্টা হয়েছে তখনই সুবিধাভোগী দখলকারী দুষ্টচক্রও নানাভাবে ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে এখনও, বর্তমান প্রশাসনকেও এদের শাসানির মুখে পড়তে হচ্ছে।

আমার সহকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী এবং বিশ্বভারতীর ভালমন্দের শরিকবন্ধুদের এই আহ্বান জানিয়ে আজকের বার্তালাপ শেষ করব যে, বিশ্বভারতীর নিকট-অতীতের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে আসুন বন্ধুত্বপূর্ণ মন নিয়ে একত্রিত হই। একটি সুমহান ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকারী হিসেবে আমাদের উত্তর-প্রজন্মের কাছে তাকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা এখন আমাদের নৈতিক কর্তব্য। হয়তো ইচ্ছাকৃত নয়, কিন্তু আমাদের ব্যর্থতার কারণে বিশ্বভারতীর যত ক্ষতি, যত ক্ষত— তা নিরাময়ের জন্য গুরুদেবের আদর্শ ও মূল্যবোধ অঙ্গীকার করে এখন প্রয়োজন আমাদের হাতে-হাত রেখে কাজে নেমে পড়া এবং গুরুদেবের সারাজীবনের সাধনাকে মর্যাদা দেওয়া।

আমার আগের বার্তালাপগুলিতে আমি যা বলেছিলাম: এই দুঃসময়ে আমরা নিশ্চয়ই কোভিড-১৯-এর কারণে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াব, এবং এইসময় মারাত্মক অদৃশ্য ভাইরাসটির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নির্ধারিত বিধিগুলি আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলব।

আস্থা রাখুন।

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ৮/০৮/2020

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

Vice-Chancellor
Visva-Bharati
Santiniketan
West Bengal-731235
India